■ তেভাগা আন্দোলন (১৯৪৫-৪৭ খ্রি.) ঃ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার অব্যবহিত পরবর্তীকালে সাম্যবাদী ধ্যানধারণা ধীরে ধীরে শ্রমজীবী মানুষের কাছে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। ভারতবর্ষেও কমিউনিস্ট দলের নেতৃত্বে সাম্যবাদী আন্দোলন সম্প্রসারিত হয়েছিল। সাম্যবাদী দর্শনের আহ্বান বাঙলার কৃষক ও সামাজিকভাবে অবহেলিত জনসম্প্রদায়কে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে সমবেত করেছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে এবং ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের প্রাক্কালে ভারতেও এই ধরনের কয়েকটি গণ-আন্দোলনে কৃষকদের অংশগ্রহণ ছিল তাৎপর্যপূর্ণ। ১৯৪৬ খ্রি. তেভাগা আন্দোলন ছিল ভারতীয় কৃষকদের স্বাধিকার অর্জন ও শোষণমুক্তির লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার অনবদ্য দৃষ্টান্ত।

প্রচলিত রীতি অনুযায়ী বাংলার বর্গাদার কৃষক বা ভাগচাষী উৎপন্ন ফসলের অর্ধেক বা তারও কম শস্য পাওয়ার অধিকারী ছিলেন। **ফ্লাউড কমিশন** সুপারিশ করেছিলেন যে, জোতদারের কাছ থেকে ভাড়া নেওয়া জমিতে কর্মরত ভাগচাষী বা বর্গাদাররা অর্ধেকের পরিবর্তে উৎপন্ন ফসলের দুই-তৃতীয়াংশ নিজেদের ঘরে তুলতে পারবেন। ১৯৪৬ খ্রি. সেপ্টেম্বর মাসে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কিষাণ সভা ফ্লাউড কমিশনের সুপারিশ কার্যকর করার দাবি তোলেন। কৃষকদের স্বার্থে প্রয়োজনে জঙ্গি আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য কমিউনিস্ট পার্টি ও প্রাদেশিক কিষাণ সভাগুলির মধ্যে প্রস্তুতি শুরু হয়। ইতিমধ্যে খাদ্যাভাব ও পণ্য সামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধি পাবার ফলে ভাগচাষিরা সহজ শর্তে ঋণ পাবার দাবি তুলেছিলেন। এই পরিস্থিতিতে শহরাঞ্চলে বহু জঙ্গি ছাত্র সমেত কমিউনিস্ট দলের কর্মীরা গ্রামে গ্রামে গিয়ে বিচ্ছিন্ন বর্গাদারদের সংগঠিত

করতে থাকে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, মন্দা ও আকালের ফলে বহু গরিব চাষি নিজেদের জমি বিক্রয় করে বর্গাদারে পরিণত হয়েছিলেন। কোনো কোনো গ্রাম ৬০% কৃষক মালিক বর্গাদারে পরিণত হয়েছিলেন।

১৯৪৬-এর শেষদিকে গ্রাম বাংলায় তেভাগা-র দাবিতে জোরালো কৃষক আন্দোলন শুরু হয়। আন্দোলনকারী কৃষকদের স্লোগান ছিল— 'নিজের খামারে ধান তোল'। উঃবঙ্গ এবং বিশেষ করে দিনাজপুরে ঠাকুরগাঁও মহকুমার এবং রংপুর, মালদা এবং জলপাইগুড়ির সংলগ্ন এলাকা তেভাগা আন্দোলনের কেন্দ্রভূমিতে পরিণত হয়। উত্তরবঙ্গে এই আন্দোলনের প্রধান শক্তি ছিল রাজবংশী সম্প্রদায়। ভবানী সেন ও অন্যান্য কমিউনিস্ট নেতারা উত্তরবঙ্গের বর্গাদারদের তেভাগা আন্দোলনে সংগঠিত করেন। এদের অধিকাংশ ছিলেন প্রান্তিক ও গরিব চাষি। কলকাতা ও নোয়াখালির সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সত্ত্বেও বহু হিন্দু ও মুসলমান তেভাগা আন্দোলনে হাতে হাত দিয়ে লড়াই করেছিলেন। এখান থেকেই উঠে আসেন হাজি মহম্মদ দানেশ ও নিয়ামৎ আলি-র মতো কিছু নেতা। এমনকী কোনো কোনো মৌলবি কোরানের বাণী উদ্ধৃত করে জোতদারদের অত্যাচারের নিন্দা করেন। যশোহর-এর নাড়াইল মহকুমার হিন্দু ও মুসলিম অধ্যুষিত গ্রাম থেকে প্রায় ১৫০০ চাষি সমবেত হয়ে তেভাগা আন্দোলন শুরু করেন। কাকদ্বীপ অঞ্চলে তেভাগা কৃষক আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন স্থানীয় কমিউনিস্ট নেতা কংসারি হালদার। ১৯৪৬-এর শেষ দিকে বাংলার বিভিন্ন স্থানে তেভাগা আন্দোলনের ঢেউ ছড়িয়ে পড়ে। উত্তরবঙ্গের তুলনায় দক্ষিণবঙ্গে তেভাগা আন্দোলনের তীব্রতা ছিল কিছুটা কম।

কোনো কোনো অঞ্চলে তেভাগা আন্দোলন জঙ্গি চরিত্র ধারণ করেছিল। তেভাগা আন্দোলনের উত্তপ্ত কেন্দ্র ছিল রংপুর। এখানে কৃষকেরা জমিদারদের খামার ভেঙে শস্য লুঠ করে। রংপুর আন্দোলনের নেতা মনিকৃষ্ণ সেন লিখেছেন যে, আন্দোলন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ার ফলে নেতৃবৃন্দ আন্দোলনকারীদের তৎপরতার সাথেপাল্লা দিতে পারেননি। **ড.সুমিত সরকার** লিখেছেন— এহে আন্দোলনের জঙ্গি চরিত্র কৃষকশ্রেণীর নেতাদেরও বিস্মিত করেছিল। **কৃষ্ণবিনোদ রায়** লিখেছেন যে, তেভাগা আন্দোলনকে আইনানুগ পথে গণতান্ত্রিক আন্দোলন হিসাবে পরিচালিত করার পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু বাস্তবে তা সম্ভব হয়নি। বিশিষ্ট কৃষক নেতা **আবদুল্লা রসুল** স্বীকার করেছেন যে, বহুক্ষেত্রে কৃষকরা স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন শুরু করার পর নেতারা সংগঠিত করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। কিন্তু তখন কৃষকদের সংযত রাখা সম্ভব ছিল না।

তেভাগা আন্দোলনের প্রাথমিক পর্যায়ে বাংলার মুসলিম লিগ মন্ত্রীসভা আন্দোলনকে সমর্থন করেছিল। কারণ পূর্ববঙ্গে অধিকাংশ বর্গাদার ছিলেন মুসলমান। দুর্ভাগ্যজনকভাবে এই আন্দোলনেও সাম্প্রদায়িক চেতনার অনুপ্রবেশ ঘটলে আন্দোলনের ভীত দুর্বল হতে থাকে। লিগ মন্ত্রীসভা আন্দোলন থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করে নিলে সরকারি নিপীড়ন তীব্রতর হয়। মন্ত্রীসভার সাথে সুর মিলিয়ে পূর্ববঙ্গে অধিকাংশ বর্গাদার মুসলমান আন্দোলন থেকে সরে আসেন ফলে আন্দোলনের তীব্রতা শিথিল হয়। **কুপার** (A. Cooper) বলেছেন, *“সাম্প্রদায়িক টানাপোড়েন প্রাদেশিক কৃষকসভাগুলিকে কখনো শক্তিশালী করেছিল আবার কখনো বা দুর্বল করেছিল। সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তি ও সংহতি কোনো কোনো ক্ষেত্রে যেমন কৃষকদের বন্ধন সুদৃঢ় করেছিল, তেমনি এরই ফলে অন্য সম্প্রদায়ের মানুষ কৃষকসভা থেকে তাদের সমর্থন তুলে নিয়েছিল। এইভাবে জাতপাত ও সাম্প্রদায়িকতার চেতনা মুঘল যুগের মতোই স্বাধীনতাকালীন তেভাগা আন্দোলনকে দুর্বল করেছিল।”*

যথার্থ কারণে শুরু হলেও এবং কৃষকদের অংশগ্রহণ সত্ত্বেও তেভাগা আন্দোলন সফল হয়নি। সাম্প্রদায়িক টানাপোড়েন ছাড়াও একাধিক কারণে এই আন্দোলন লক্ষ্য পূরণের আগেই থেমে গিয়েছিল।” যেমন—

(১) কৃষকরা লাঠিকে রাইফেলের মতো ধরে এবং রাইফেলের সমশক্তিধর ভেবে লড়াই-এ নেমেছিল। কিন্তু লাঠি নিয়ে রাইফেলের সাথে পাল্লা দেওয়া ছিল অবাস্তব কল্পনা।

(২) দিনাজপুরের জঙ্গি কৃষকরা সশস্ত্র লড়াই-এর দাবি তুললেও কমিউনিস্টরা তাতে মত দিতে পারেননি। কারণ কমিউনিস্টদের কাছে তেভাগা আন্দোলন ছিল অর্থনৈতিক দাবি আদায়ের আন্দোলন, কোনো জঙ্গি লড়াই নয়।

(৩) **ড. সুমিত সরকার**-এর মতে সামাজিক সীমাবদ্ধতাও আন্দোলনকে দুর্বল করেছিল, জলপাইগুড়ির ডুয়ার্স অঞ্চলে জনজাতির কৃষকরা সশস্ত্র জঙ্গি আন্দোলনে নামতে চাইলেও মধ্য ও প্রান্তিক চাষিদের কাছ থেকে তারা কোনো সমর্থন পায়নি।

(৪) উত্তরবঙ্গের শহরগুলিতে বসবাসকারী বিভিন্ন বৃত্তিজীবী মানুষ আন্দোলনের প্রতি বৈরীভাবাপন্ন ছিলেন। কারণ এদের অনেকেই ছিলেন কৃষিজমির মালিক। যারা বর্গাদারদের দিয়ে চাষ করাতেন।

(৫) **হামজা আলাভি** (Hamza Alavi) তাঁর 'Peasants and Revolution' প্রবন্ধে বলেছেন যে, তেভাগা আন্দোলনে মাঝারি চাষিদের যথেষ্ট অংশগ্রহণ না থাকায় আন্দোলন ব্যর্থ হয়েছিল।

(৬) **ধনাগারে** (D. N Dhanagare) তাঁর 'Peasants Movement in India' গ্রন্থে Alavi-র ব্যাখ্যাকে অতি সরলীকরণ বলেছেন। Dhanagare- মতের চার থেকে ছয় একর জমির মালিক যারা বর্গাদারদের পক্ষেই ছিলেন। যে অঞ্চলে তাদের জমি বর্গাদার দিয়ে চাষ করাতেন সেখানে তারা আন্দোলনকে সমর্থন করেননি। তাঁর মতের 'তেভাগা আন্দোলনের প্রধান শক্তি ছিল দরিদ্র কৃষক অর্থাৎ বর্গাদারেরা।'

(৭) কমিউনিস্ট নেতৃত্ব আন্দোলনের ব্যর্থতার জন্য দায়ী ছিল। কৃষিক্ষেত্রে শ্রেণিবিন্যাসকে গুরুত্ব না দেওয়ার ফলে তারা ছোট ও বড় চাষির মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গীগত প্রভেদ অনুধাবন করতে পারেননি।

ব্যর্থতা সত্ত্বেও তেভাগা আন্দোলন বাংলার কৃষকদের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনার জন্ম দিয়েছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই, এই আন্দেলনে প্রায় ৪৯৭ জন কৃষক শহিদের মৃত্যুবরণের ঘটনা নিঃসন্দেহে অর্থনৈতিক স্বার্থে কৃষকশ্রেণির জাগরণের প্রমাণ দেয়। বাংলার তেভাগা আন্দোলন স্বাধীন ভারতে ভূমিসংস্কার আন্দোলনের ক্ষেত্রে একটি দিক নির্দেশিকা হিসাবে চিহ্নিত হয়।